ইউনিট
৭

প্রেষণা (Motivation)

ভূমিকা

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের প্রেষণা দান বা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের কার্যক্ষমতার পুর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া। কোনো কর্মীর কাজ সমন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা থাকাই কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন কর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা বা আগ্রহ। তাই কর্মীদের মনকে প্রভাবিত করে কার্যক্ষেত্রে তাদের সর্বোত্তম সহযোগিতা ও ঐকান্তিকতা লাভ করাই প্রেষণার উদ্দেশ্য।

পাঠ ১ প্রেষণার সংজ্ঞা (Definition of Motivation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ প্রেষণা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- ⑤ প্রেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রেষণার সংজ্ঞা
(Definition of Motivation)

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রেষণা (Motivation), প্ররোচক (Motivator), প্রেষিত আচরণ (Motivated behavior) বিষয় তিনটিকে এক করে দেখা হয়। কিন্তু বিষয় তিনটির মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। তাই বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার জন্য নিম্নে আমরা তিনটি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করছি ঃ

প্রেষণা (Motivation)

প্রেষণা বলতে বুঝায় প্রাণীর এমন একটি অবস্থা, যা তাকে কোন আচরণ বা কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালিত করে।

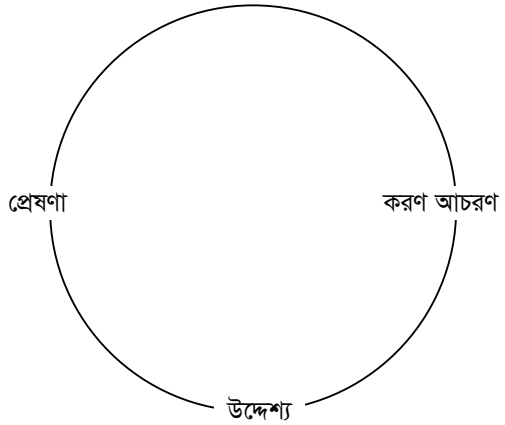

চিত্র ঃ প্রেষণা চক্র

প্ররোচক (Motivator) ঃ প্ররোচনা হচ্ছে এমন বাহ্যিক উপাদান যা ব্যক্তির চাহিদা পূরণ বা তার অভাববোধ দূর করতে সক্ষম। প্ররোচক মূলতঃ দুই রকমের, আর্থিক ও অনার্থিক। আর্থিক প্ররোচক যেমন বেতন, বোনাস ইত্যাদি ও অনার্থক প্ররোচক যেমন পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ সুবিধা ইত্যাদি।

প্রেষিত আচরণ (Motivtional Behavior) ঃ প্ররোচক প্রদানের ফলে একজন মানুষ যে আচরণ প্রদান করে তা হলো ঐ ব্যক্তির প্রেষিত আচরণ। প্রেষিত আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

২. প্রেষিত আচরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

৩. প্রেষিত আচরণ ভারসাম্য সংস্থাপক।

৪. প্রেষিত আচরণ অভ্যন্তরীণ ভাবে সৃষ্ট।

আরও সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা আবার প্রথম উদাহরণটি উল্লেখ করতে পারি।

প্রেষণা হলো → উৎপাদন বৃদ্ধি করার মানসিক অবস্থা;

প্ররোচক → বোনাস প্রদানের প্রস্তাব;

প্রেষিত আচরণ → উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নে বিশিষ্ট মনীষীদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

Weihrich and koonts এর মতে- "প্রেষণা হলো এমন একটি সাধারণ ধারণা বা বিষয় যা সকল শ্রেণীর তাড়না, ইচ্ছা, প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং এ ধরনের শক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।"

M. J. Gannon- এর মতে- "প্রেষণার মূল অর্থ একজন ব্যক্তির প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং ধারণাসমূহ যা তাকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কাজ করতে উৎসাহ দেয়।"

সহজ ভাষায় প্রেষণা হলো মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। এটি একটি শক্তি যা কোন ব্যক্তিকে, বিশেষ কোন কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন ছাত্র যদি মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করে তাহলে, তার পেছনে যেমন ধনাত্মক প্রেষণা কাজ করে, আবার কোন ছাত্র যদি পড়াশোনায় অমনোযোগী হয় তার পেছনেও প্রেষণার অবদান আছে, তবে এটি ঋণাত্মক প্রেষণা অর্থাৎ আমাদের সব কাজের পেছনেই প্রেষণা আছে- তা কাজটি ভালই হোক আর মন্দ হোক।

প্রেষণার তারতম্যের জন্য সংগঠনে কোন কর্মী কাজে মনোযোগী, শৃঙ্খলাপরায়ন এবং উদ্যোগী, আবার কোন কর্মী কাজে অমনোযোগী, বিশৃঙ্খল, নিরুদ্যম হয়। ছাত্রদের মধ্যেও কেউ পড়াশুনা ছেড়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে যায়। এসব ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব প্রেষণা তাদেরকে প্রভাবিত করে।

প্রেষণার মূল হলো মানুষের প্রয়োজন বা অভাব। মানুষের দেহে ও মনে যখন অভাববোধ থাকে তখন তা পূরণ করার জন্য কতকগুলো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণবোধ জন্ম নেয়। লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে যে কাজ করতে হয় তা হলো মানুষের ব্যবহার বা আচরণ। বিষয়টি নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ

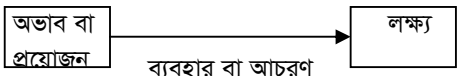

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ধরুন আপনার খুব পিপাসা পেয়েছে। পিপাসা হলো আপনার অবাব বোধ বা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে এক গ্লাস পানি আপনার খুবইপ্রয়োজন। কেননা, এই এক গ্লাস পানি আপনার পিপাসা পূরণ করতে পারে। কাজেই এটাই হলো আপনার লক্ষ্য। পিপাসা পূরণ হলে আর এই অভাববোধ আপনাকে প্রভাবিত করবেনা। পানি পান করার জন্য আপনাকে কলের কাছে গিয়ে গ্লাস ভর্তি করে অথবা কাউকে পানি খাওয়ানোর অনুরোধ করা বা আদেশ দেওয়ার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে- সেটাই আপনার ব্যবহার বা আচরণ।

মানুষের অভাব বা প্রয়োজনবোধ অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন-

* অর্থের প্রয়োজন
* নিজেকে মুল্যবান অনুভব করার প্রয়োজন
* সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমীহ লাভের প্রয়োজন
* জনপ্রিয়তার প্রয়োজন
* ভালবাসার প্রয়োজন
* শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উন্নতির প্রয়োজন
* দৈহিক আবশ্যকীয় তা মেটাবার প্রয়োজন
* সুনাম ও স্বীকৃতির প্রয়োজন
* ব্যক্তিগত ও উচ্চাশা বা লক্ষ্য পূরণের প্রয়োজন
* আরাম-আয়েশ বা ভোগ বিলাসের প্রয়োজন

* নিরাপত্তার প্রয়োজন ইত্যাদি

এই ধরনের অভাব পূরণের জন্য মানুষের যে বাগ্রতা তাই হলো প্রেষণা। অর্থাৎ মানুষের আচরণকে যা প্রভাবিত করে তাকেই প্রেষণা বলা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রেষণা হলো মানুষের এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা তাকে কোন কাজে বা আচরণে উদ্বুদ্ধ বা নিবৃত্ত করে।

প্রেষণার গুরুত্ব
(Importance of Motivation)

ব্যবস্থাপনার কাজ হলো অন্যের দ্বারা কাজ করে নেয়া। কিন্তু কাজের ব্যাপারটি কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টির সাথে অসম্পর্কীত। প্রকৃতপক্ষে কেউ কাজ করতে না চাইলে তাকে দিয়ে জোর করে কাজ করানো যায় না। তাই আধুনিক ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সন্তষ্টি অর্জনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। নিম্নে প্রেষণার কতিপয় গুরুত্ব আলোচনা করা হলো–

১. **উচ্চ মনোবল উন্নয়ন** (Development of high morale) ঃ
প্রেষণা কর্মীদের উচ্চ মনোবল গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং কাজের প্রতি অধিক আন্তরিক করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিরোধী যে কোন কার্যকলাপে নিরুৎসাহিত করে। ফলে প্রতিষ্ঠানে একটি উত্তম কার্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

২. **অধিক উৎপাদন** (Mass production) ঃ
প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে যথাসম্ভব কম ব্যয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের উপর। এর জন্য অবশ্যই কর্মীদের শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া উচিত। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা অকার্যকর হয়ে পড়লে কখনই অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হতে পারে না।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি** (Increase in efficiency) ঃ
কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মীরা সেই কাজে আনন্দ পায় এবং আনন্দ সহযোগে যে কোন কর্ম প্রচেষ্টা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা কাজে নিরানন্দ বোধ করে যা ক্রমে তাদের দক্ষতাকে হ্রাস করে।

৪. **উত্তম শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা** (Establishing fair labor Management relation) ঃ
উত্তম শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রেষণার দ্বারাই তা অর্জন করা সম্ভব। কর্মীদের মানসিক দিক হতে যত সন্তুষ্ট রাখা যাবে ব্যবস্থাপনার প্রতি তাদের ধারণা ও আন্তরিকতা তত বাড়বে। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা আন্দোলন করে এবং এতে করে ও শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক খারাপ হয়।

৫. **অপচয় হ্রাস** (Reduction in wastage) ঃ
প্রেষণা অপচয় হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীদের শ্রম ঘন্টার যে অপচয় হয় বা কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য নানাবিধ যে সকল অপচয় বা ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়, উত্তম প্রেষণার বদৌলতে তা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

৬. **উদ্যোগ ও উন্নয়ন** (Initiaive and development) ঃ
প্রেষণা শুধু মানসিক সন্তুষ্টিই সৃষ্টি করে না তা কর্মীদেরকে নব-নব পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে উত্তম উপায়ে কাজ সম্পাদনে উদ্যোগী করে তোলে। যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় (Methods of Motivation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ কিভাবে কর্মীদের কাজে প্রেষণা দেয়া যায় বলতে পারবেন।

প্রেষণাদানের উপায়
(Methods / Ways of Motivation)

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক-কর্মীদের নিকট হতে কাজ আদায়ে প্রেষণা দানের গুরুত্ব সকল মহলেই স্বীকৃত। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রেষণাদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত থাকলেও একে প্রকৃতি অনুযায়ী আর্থিক ও অনার্থিক দুভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এ ধরনের উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

ক. আর্থিক প্রেষণা (Financial Motivation) ঃ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে কর্মীদিগকে কাজে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়াকে আর্থিক প্রেষণা হিসাবে অভিহিত করা যায়। অর্থের সাথেই ইহা সম্পৃক্ত। নিম্নে এর উপাদানসমূহ আলোচিত হলো-

১. **বেতন (Salary)** ঃ উচ্চ বেতন স্বভাবতই কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করে। বেতন বলতে এক্ষেত্রে মূল বেতনকেই বুঝায়। কর্মী যদি তাকে প্রদত্ত বেতন অন্যায্য মনে করে তাহলে কাজে সে নিরুৎসাহ বোধ করে।

২. **মুনাফার অংশ (Profit Sharing)** ঃ সাধারণভাবে মুনাফা মালিকের প্রাপ্য। কর্মীদের যদি মুনাফার একটি অংশ দেয়া হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে যেমনি তারা উৎসাহিত হয় তেমনিভাবে মুনাফা বৃদ্ধির জন্যও তারা সচেষ্ট থাকে।

৩. **উৎপাদন বোনাস (Productivity bonus)** ঃ এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্ররোচক প্রদান কল্পে কোন নির্দিষ্ট কাজে কর্মচারীদের উৎপাদন মুল্যায়নের জন্য একটি আদর্শ হার বা মান সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আদর্শ পরিমাণের চেয়ে বেশি, প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে বোনাস দেয়া হয অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যত বেশি উৎপাদন করতে পারে, তাকে একটি নির্দিষ্ট হারে তত বেশি বোনাস দেয়া হয়। উৎপাদন বোনাস ব্যক্তি বা দলগতভাবে দেয়া যেতে পারে।

৪. **কার্য সম্পাদন বোনাস (Performance bonus)** ঃ এ পদ্ধতিতে কোন কর্মচারীকে শুধু উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়ার পরিবর্তে, তার সামগ্রিক কার্যসম্পাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়া হয়। কার্যসম্পাদন = কর্মদক্ষতা * প্রেষণা এ সূত্র থেকে দেখা যায় যে, কার্যসম্পাদনের উপর কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার প্রভাব সংযোজনশীল নয় বরং গুননশীল। নিম্নে চিত্রে প্রেষণার সাথে কার্যসম্পাদনের সম্পর্ক দেখানো হলো-

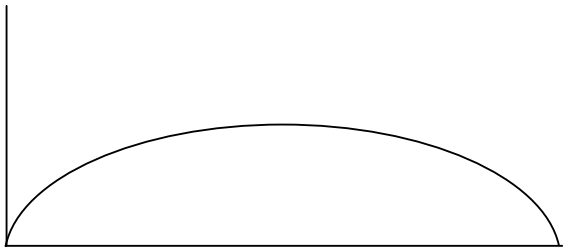

চিত্র ঃ প্রেষণার সাথে কার্যসম্পাদনের সম্পর্ক

প্রেষণার মাত্রা যখন মাঝামাঝি থাকে, তখন কার্য সম্পাদনের মাত্রা সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায়। প্রেষণার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্য সম্পাদন কম হয়। তাই আর্থিক প্রেষণা দেবার সময় বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন খাতে কর্মী সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রেষিত না হয় তবে যথাযথ কার্য সম্পাদন বোনাস প্রদান করা জরুরী।

৫. **দলগত প্ররোচক পরিকল্পনা (Group incentive plan)** ঃ এ পদ্ধতিতে কোন কর্মদল (work group) এর সদস্যকে ব্যক্তিগত উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দিয়ে, তার দলের সামগ্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়া হয়। দলগত ভাবে উৎপাদন বোনাস প্রদান করার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কোন কোন কর্মে ব্যক্তির উৎপাদনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা দূরূহ ব্যাপার।

৬. **প্রান্তিক সুবিধা (Fringe benefits)** ঃ আর্থিক প্ররোচক বলতে শুধু মজুরি বা বেতনকে বুঝায় না। চাকরিতে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক সুবিধাও (যেমন, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, চিত্তবিনোদন ভাতা, অবসর ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ডোর সুবিধা ইত্যাদি) আর্থিক প্ররোচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রান্তিক সুবিধাসমূহ প্ররোচক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আর্থিক প্ররোচক প্রেষণা প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে তবে অর্ধস্তন কর্মীরা সাধারণতঃ এক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় প্রেষিত হয়। তবে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

খ. অনার্থিক প্রেষণা (Non-financial Motivation) ঃ

অর্থের বাইরে যে সকল উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় তাকে অনার্থিক প্রেষণা বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে কর্ম প্রেষণা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকম অনার্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়। যেমন, ভাল কার্য সম্পাদনের স্বীকৃতি ও পুরস্কার, ফলাফলের জ্ঞান, প্রতিযোগিতা, অভিন্ন লক্ষ্য, দায়িত্বে অংশীদারিত্ব, সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, কাজের নিরাপত্তা, কার্যাবলীতে স্বাধিকার, পদোন্নতির সুযোগ, সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক, প্রশিক্ষণের সুবিধা, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ, সরাসরি যোগাযোগ এবং সৃজনশীলতায় উৎসাহ দান। এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১. **স্বীকৃতি ও পুরস্কার (Recognition and reward) ঃ**

ভাল কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ফলে আত্মতৃপ্তি অর্জিত হয়। স্বীকৃতি লাভ মানুষের কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি করে এবং তাকে ক্রমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একাগ্র ও উৎকর্সকৃত করে তোলে। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সাধারণতঃ স্বীকৃতি ও পুরস্কার এর মাধ্যমে বেশি মাত্রায় কার্য প্রেষিত হয়।

২. **ফলাফলের জ্ঞান (Feedback) ঃ**

ফলাফলের জ্ঞান ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ধরনের কার্যসম্পাদনের জন্যই প্রেষণা বৃদ্ধি করে। কার্যের ফলাফলের জ্ঞান নিপুণভাবে কার্যসম্পাদনে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. প্রতিযোগিতা (Competition) ঃ

মানুষের কর্ম প্রেষণা বৃদ্ধির আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক কর্ম পরিবেশ সৃস্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক কার্য পরিবেশে ব্যক্তি কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

৪. অভিন্ন লক্ষ্য (Common Goal) ঃ

প্রেষিত আচরণ সর্বদাই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে কার্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে হলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও কর্মচারীদের লক্ষ্য অভিন্ন হতে হবে। লক্ষ্য অভিন্ন হলে কর্মীরা কার্যে প্রেষিত হয়।

৫. সিদ্ধান্ত অংশ গ্রহণ (Participation in Decision Making) ঃ

কোন নির্দিষ্ট কর্মের ব্যাপারে আগ্রহও প্রেষণা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, কর্মীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। সাধারণতঃ উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকরা এ সুযোগ পেলে বেশি মাত্রায় কার্যে প্রেষিত হয়।

৬. চাকরির নিরাপত্তা (Job Security) ঃ

কর্মজীবনে অনিশ্চয়তা ও চাকুরিচ্যুতির ভয় থেকে প্রত্যেকেই নিরাপত্তা চায়। চাকুরী নিরাপত্তা না থাকলে কোন কর্মী কাজে মনোযোগ দিতে পারে না এবং কার্যে প্রেষিত হয় না। তবে নিম্নস্তরের কর্মীরা চাকুরী নিরাপত্তা বিষয়টি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

৭. কর্মে স্বায়ত্তশাসন (Autonomy in work) ঃ

সাধারণতঃ মানুষ কর্মক্ষেত্রে স্বাধিকার চায়। নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি অন্যের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির ঘাটিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা পেলে কর্মে তার উৎসাহ, উদ্দীপনা, দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

তবে উচ্চস্তরের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মচারীদের চেয়ে স্বায়ত্বশাসনকে কর্মসন্তুষ্টি ও প্রেষণার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে।

৮. পদোন্নতির সুযোগ (Opportunity for promotion) ঃ

প্রত্যেক পেশাগত জীবনে পদোন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে। নিম্নস্তরের কর্মীদের চেয়ে ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহী কর্মকর্তারা পদমর্যাদার বেশি গুরুত্ব দেন। একটি গবেষণা হতে দেখা গেছে যে কর্মচারীরা পদোন্নতিকে কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে।

৯. সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক (Good Relation with co-workeny) ঃ

সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক ব্যক্তি ও দলের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে ও কর্মীর মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।

১০. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ (Adoption of sound Mgt priniciples) ঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মনোবল, কর্ম সন্তুষ্টি, ও প্রেষণা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ। এর মাধ্যমে কর্মীদেরকে কার্যে প্রেষিত করা যায়।

১১. প্রশিক্ষণের সুবিধা (Training Facilities) ঃ

উত্তম প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকলে কর্মীরা কার্যে প্রেষিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মে অধিকতর দায়িত্ববান হয়।

১২. উন্মুক্ত যোগাযোগ (Open communication) ঃ

শ্রমিক ব্যবস্থাপকের মধ্যে মতামত বিনিময়ের কার্যকরী ব্যবস্থা থাকলে কর্মীদের মনোবল ও কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

১৩. সৃজনশীলতার উৎসাহ প্রদান (Encourgement of Creativity) ঃ

মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করা। কর্মে সৃজনশীলতার সুযোগ থাকলে কর্মীরা কর্মে প্রেষিত হয়। সাধারণতঃ উচ্চ স্তরে কর্মীরা এতে কার্যে প্রেষিত হয়।

আর্থিক ও অনার্থক উভয় ধরণের প্ররোচকই কর্মীর প্রেষণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে নিম্নস্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে আর্থিক প্ররোচক ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আবার ব্যবস্থাপক ও নির্বাহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনার্থিক প্ররোচক কর্যে প্রেষিত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

পাঠ ৩ প্রেষণার তত্ত্বসমূহ (Theories of Motivation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রেষণার বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রেষণার তত্ত্বসমূহ (Theories of Motivation)

প্রেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষি ও গবেষক বিভিন্ন তত্ত্বের উন্নয়ন সাধন করেছেন। এরূপ কতিপয় বিখ্যাত তত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) মাজলোর প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব

(Maslow's Hierarchy of Needs Theory)

আব্রাহাম মাজলো একজন মনোবিজ্ঞানী। তার প্রদত্ত প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব, প্রেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে মানুষের প্রয়োজনকে পাঁচটি স্তরে বা পর্যায়ক্রমে ভাগ করা হয়েছে। তার মতে নিচের স্তরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পরই মানুষ পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে ধাপে ধাপে মানুষের প্রয়োজনবোধ সর্বোচ্চ স্তরে চলে যায়। নিম্নে রেখা চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

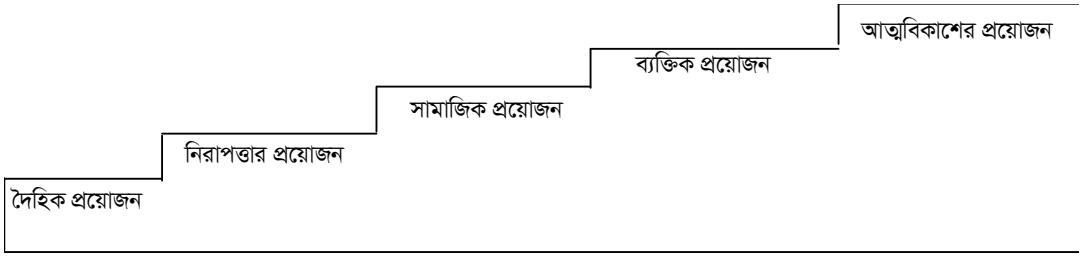

চিত্র ঃ মাজলোর স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব

চিত্রে প্রদত্ত মাজলোর প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্বের প্রতিটি স্তরের আলোচনা করা হলো ঃ

(১) দৈহিক প্রয়োজন (Physiological Need)

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যা কিছু দরকার তাই হলো দৈহিক প্রয়োজন। অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান, আলো বাতাস ইত্যাদি সবকিছুই দৈহিক প্রয়োজনের আওতায় পরে। এগুলো ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই এগুলো সবার আগে পূরণ করা প্রয়োজন। সংগঠনের কর্মীরা তাই সবার আগে বেতন ভাতার মাধ্যমে খাবার, কাপড় ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা চায়। এই ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ সব কিছুই করতে রাজী থাকে।

(২) নিরাপত্তার প্রয়োজন (Security Need)

দৈহিক প্রয়োজন যখন মোটামুটিভাবে মিটে যায়, তখন মানুষ নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করে। নিরাপত্তা দু'রকমের হতে পারে একটি হলো দৈহিক নিরাপত্তা আর অন্যটি হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। মানুষ যেমন জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সাধারণত নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তেমনি রুটি-রুজির নিরাপত্তা খোঁজে। কাজেই চাকুরীর স্থায়ীকরণ, ভবিষ্যৎ সঞ্চয় করা ইত্যাদি নিরাপত্তাজনিত অভাববোধ, বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের নিশ্চয়তার ভাবনা থেকেই মানুষের নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজন অনুভূত হয়।

(৩) সামাজিক প্রয়োজন (Social Need) ঃ

মানুষ যখন কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তায় তুষ্ট হয় তখনই সে বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রশংসা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেতে আগ্রহী হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরাও যখন প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধাসহ স্থায়ী চাকুরিতে বহাল হয় তখনই তারা সামাজিক প্রয়োজন অনুভব করে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়।

(৪) আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন (Esteem Need) ঃ

অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর পর মানুষ আত্মতৃপ্তির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আত্মতৃপ্তিতেই অনেকে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ আত্মতৃপ্তির জন্যই কর্মীদের বড় চাকুরী, গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নিচের তিনটি ধাপ পুরণ হলে বা প্রয়োজন মিটে গেলেই মানুষের কাছে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়।

(৫) আত্মবিকাশের প্রয়োজন (Self-actualization Need) ঃ

আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন মোটামুটিভাবে মিটে গেলে মানুষ আত্মবিকাশের প্রয়োজন অনুভব করে। মাজলোর মতে এটি প্রয়োজনের সবচাইতে উপরের স্তর। এটা হলো মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা। মানুষ যে কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন, যখন যে কাজটি সবচাইতে ভালভাবে করার চেষ্টা চালায়, তখন তার আত্মবিকাশের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

(খ) হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব

(Herzberg's Two Factor Theory)

সংগঠনের পটভূমিতে পরিচালিত গবেষণায় হার্জবার্গ ও তার সহযোগীরা প্রেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের উৎপাদাকের ভূমিকা লক্ষ্য করেন। এ দু'টি হলো মোটিভেটর (Motivator) ও হাইজিন (Hygiene)। গবেষণায় তারা লক্ষ্য করেন যে, কর্মীদের কাজের সন্তুষ্টি মূলত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত চলকগুলোর উপর নির্ভর করে এবং কর্মে অসুন্তষ্টি কাজের বাইরের চলক বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রথম দলের চলকগুলোকে মোটিভেটর এবং দ্বিতীয় দলের চলকগুলোকে তারা হাইজিন উৎপাদক বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মোটিভেটর বা সন্তুষ্টি উৎপাদক কাজের আভ্যন্তরিণ উপাদান। আর হাইজিন বা অসন্তুষ্টি উৎপাদক মূলতঃ কাজের বাহ্যিক বা পরিবেশগত উপাদান। নিচে এই দুই ধরনের চলকের কয়েকটি উৎপাদক তুলে ধরা হলো ঃ

মোটিভেটর বা সন্তুষ্টি উৎপাদক	হাইজীন বা অসন্তুষ্টি উৎপাদক
কাজের স্বীকৃতি	সংগঠনের নীতি ও রীতি
পদোন্নতি	বেতন ও ভাতা
দায়িত্ব	পারস্পরিক সম্পর্ক
কীর্তি	কাজের নিরাপত্তা
কাজটি নিজেই	কাজের পরিবেশ

যে সমস্ত চলক না হলে কাজে সন্তুষ্টি আসে না সেগুলোকে মোটিভেটর উৎপাদক বলে। আর যে সমস্ত চলকের অভাবে কাজে অসন্তুষ্টি আসে তাকে হাইজীন উৎপাদক বলে। সংগঠনে হাইজীন উৎপাদকের মাধ্যমে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু সন্তুষ্টি আনয়ন করা যায় না। কর্মীদের কাজে সন্তুষ্টি আনতে হলে সন্তুষ্টির উৎপাদকগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

(গ) ভিক্টর এইচ ভ্রুমের প্রত্যাশা তত্ত্ব

(Victor H. Vroom's Expectancy Theory)

প্রেষণার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা তত্ত্বের মূল কথা হলো, মানুষ যখন মনে করে তার কাজের মাধ্যমে কোন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব- তখনই যে কাজটি করার প্রেষণা অনুভব করে। প্রত্যাশার মাধ্যমে প্রেষণা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভ্রুম, মানুষের পছন্দ ও বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ঘঠনা ঘটবার সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে ব্যক্তির প্রেষণার শক্তি নির্ভর করে তার সামগ্রিক পছন্দ এবং প্রত্যাশার গুণিতক সম্পর্কের উপর। অর্থাৎ-

$$\text{Force} = \text{Valence} \propto \text{Expectancy}$$

(প্রেষণার শক্তি = সামগ্রিক পছন্দ * প্রত্যাশা)

এখানে ভ্যালেন্স হলো ফলাফলের প্রতি ব্যক্তির তুলনামূলক সামগ্রিক পছন্দ এবং প্রত্যাশা হলো সেই ফলাফলটি তার প্রেষণার মাধ্যমে ঘটবার সম্ভাবনা। কাজেই কোন কাজের ফলাফল ঘটবার প্রত্যাশা যদি না থাকে তাহলে তার প্রতি ব্যক্তির কোন প্রেষণা থাকবে না। আবার ফলাফলটি যদি তার পছন্দনীয় না হয় তাহলেও ব্যক্তি সে কাজটি করার প্রেষণা অনুভব করবে না।

(ঘ) ম্যাকলেল্যান্ড এর কীর্তিমূলক প্রেষণা তত্ত্ব

(Mecllеland's Needs Theory of Motivation)

ম্যাকলেল্যান্ড তিন ধরনের মুল প্রয়োজন চিহ্নিত করেছেন, যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো-

* সংলগ্নতার প্রয়োজন
* ক্ষমতার প্রয়োজন
* কীর্তির প্রয়োজন।

গবেষণার মাধ্যমে ম্যাকলেল্যাণ্ড দেখেছেন যে, যে সব ব্যক্তির মধ্যে সংলগ্নতার প্রয়োজন বেশী তারা সহকর্মীদের সমর্থন ও ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বেশী কামনা করে। ব্যক্তি হিসেবে তারা সবার সাথে সখ্যতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। যাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োজন বেশী তারা নেতা হতে চায়, সিদ্ধান্ত নিতে চায় এবং ক্ষমতাও প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

যারা কীর্তির প্রয়োজন বেশী মাত্রায় অনুভব করে, তাদের মধ্যে সফল হবার প্রবল ইচ্ছা এবং ব্যর্থ হবার প্রবল অনিচ্ছা দেখা দেয়। তারা দুঃসাহসিক কাজ করতে পছন্দ করে। অবশ্য তারা অতিমাত্রায় ঝুঁকি নেয় না। যে কাজের ফলাফল তাদের উপর নির্ভরশীল সেসব কাজে তারা বেশী আগ্রহী হয়। অর্থাৎ কখনও তারা ভাগ্যের উপর ভরসা করে না।

পাঠ সংক্ষেপ

* প্রেষণা হলো এমন একটি মানসিক অবস্থা যা মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ বা নিবৃত্ত করে।
* প্ররোচক-বিভিন্ন উপাদান বা ব্যক্তির চাহিদা বা অভাববোধ দূর করে।
* প্রেষিত আচরণ- প্ররোচক প্রদানের ফলে একজন মানুষ যে আচরণ প্রদান করে তা হলো ঐ ব্যক্তির প্রেষিত আচরণ।
* প্রেষণা উচ্চ মনোবল গঠনে ভূমিকা রাখে।
* ইহা অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে।
* উত্তম শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রেষণা।
* আর্থিক ও অনার্থিক এই দুই উপায়ে কর্মীদেরকে প্রেষিত করা যায়।
* আর্থিক প্রেষণা যেমন, বেতন, মুনাফার অংশ, বোনাস, আর্থিক নিরাপত্তা, ঋণ ও অগ্রীম ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদেরকে প্রেষিত করা যায়।
* অনার্থিক প্রেষণা যেমন, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, অধিকার, সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা, উত্তম ব্যবহার ইত্যাদির

মাধ্যমে কর্মীদেরকে কার্যে প্রেষিত করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। প্রেষণা বলতে কি বুঝেন? ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩। অনার্থিক প্রেষণাদানের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
৪। প্রেষণার ক্ষেত্রে মাজলোর স্তরীভূত সোপান তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
৫। হার্জবার্গের দ্বি উপাদান তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
৬। ভিক্টর এইচ ভ্রুমের প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। প্রেষণার সংজ্ঞা দিন।
২। আর্থিক প্রেষণার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করুন।
৩। ম্যাকলেল্যাণ্ড-এর প্রেষণা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।